বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাচিন্তা : ব্রিটিশ পর্ব

মোহাঃ তানভীর হায়দার*

[সারসংক্ষেপ : ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হলে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু উভয় সমাজেই ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে উভয় সমাজ দুর্দশায় পতিত হলেও হিন্দুরা নানাভাবে নিজেদের পুনর্গঠনের সুযোগ পায় কিন্তু মুসলমানদের তেমন সুযোগ না থাকায় তারা অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে পৌঁছে যায়। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও এ অবনমন ছিল শোচনীয়। বিশেষ করে রাজভাষা ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালু হলে মুসলমানদের জন্য তার ফল হয় মারাত্মক। অপরদিকে বিধর্মীর ভাষা শিখতে মুসলমানরা কোনোভাবেই সম্মত ছিল না। যে কারণে তাদের পতন হয় ত্বরান্বিত। কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া যে মুসলমানের উন্নতির উপায় নেই এই উপলব্ধি সমাজ-নেতারা বহু বিলম্বে উপলব্ধি করেন। তারপরও তারা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করলেও আশানুরূপ ফল লাভ হয়নি। আলোচ্যমান প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের এ বিষয়ক চিন্তা-চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস রয়েছে।]

বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাভাবনা সব সময় সরল পথে অগ্রসর হয়নি, অধিকাংশ সময়ই তা জটিল রূপ ধারণ করেছে। যদিও শিক্ষাই উন্নতির সোপান তথাপি বাঙালি মুসলমান এই উন্নতির জন্য আধুনিক বা যুগোপযোগী শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে সীমাহীন অসচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। উনিশ শতকে জাতির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল ইংরেজি ভাষাশিক্ষা ও ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চা, কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাঙালি মুসলমান সমাজে এ শিক্ষাগ্রহণের প্রশ্নে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দেখা দেয় (ওয়াকিল, ১৯৯৭ : ৪৭২)। এই দ্বিধা-সংশয় অতিক্রম করে ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণের মানসিকতা তৈরি হতে মুসলমান সমাজের বহু সময় অপচয়িত হয়। এর ফলে সমাজের উন্নয়ন-অগ্রগতি শুধু ব্যাহত হয় তা-ই নয়, বরং সমাজ-গতি বিপরীত দিকে চলতে শুরু করে। তাছাড়া মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করার ফলও হয়েছে বিষময়।

মুসলমান আমলে রাজভাষা হিসেবে ফারসি চালু ছিল। সুতরাং রাজপদ লাভের আশায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় ঐ ভাষা শিক্ষা করত। আর সে কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আরবি-ফারসির কদর ছিল। পরবর্তীকালে উর্দুর আমদানি হলে এটিও আরবি-ফারসির পাশে স্থান করে নেয়। হিন্দু সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা হিসেবে সংস্কৃতের প্রচলন ছিল। এর পাশাপাশি মাতৃভাষা বাংলার চর্চা ছিল অত্যন্ত ক্ষীণ (ওয়াকিল, ১৯৯৭ : ৪৭২)। ইংরেজদের আগমনের ফলে ইংরেজি ভাষাও জায়গা করে নিল। এ পর্যন্ত ভাষা নিয়ে মুসলমানদের তেমন কোনও সংকটে পড়তে হয়নি। কেননা ফারসি শিক্ষিত মুসলিম সম্প্রদায় বিভিন্ন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু বিপত্তি দেখা গেল ১৮৩৭ সালে রাজভাষা হিসেবে ইংরেজির প্রবর্তন হলে। কারণ, রাজভাষা পরিবর্তনের ফলে ফারসির জ্ঞান মুসলমানদের কোনও কাজে আসল না। ইংরেজি ভাষা না জানার কারণে রাজপদ হারিয়ে তারা দৈন্যদশায় পতিত হলো।

*সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা।

এই পরিস্থিতিতে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করা গেল মুসলমানরা এই পরিবর্তনের জন্য কোনও রূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি বরং গোঁড়ামির পরিচয় দিয়ে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখল। আর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় রাজভাষা ইংরেজি শিক্ষা করে শনৈঃশনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হলো।

বস্তুত মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থায় বিপর্যয় শুরু হয় ইংরেজদের ভারতবর্ষ অধিকারের ফলে। উইলিয়াম হান্টার-এর *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স* গ্রন্থে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন:

> আমরা যেমন একদিকে তাদের (মুসলমানদের) পক্ষে অনুপযুক্ত একটা জনশিক্ষাপ্রণালী আমদানি করেছি, তেমনি অন্যদিকে তাদেরই মূলধন আত্মসাৎ করেছি, যা দিয়ে তাদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রণালী চালিত হতো। বাঙলা দেশের প্রত্যেক খান্দানী মুসলমান পরিবার একটি নিজস্ব শিক্ষায়তন পোষণ করতেন। সেখানে তাঁদের নিজেদের এবং প্রতিবেশী দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েরা বিদ্যাশিক্ষা করতো। বাংলার মুসলমান পরিবারসমূহ যেমন ক্ষয় পেতে লাগলো, এ-সব শিক্ষায়াতনও তেমনই সংখ্যায় কমে যেতে লাগলো এবং তাদের যোগ্যতার মানও পড়ে যেতে লাগলো। (হান্টার, ২০১৬ : ১২১)

হান্টারের এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, ইংরেজ-শাসনের ফলে অনেক অভিজাত মুসলিম পরিবার দেশত্যাগ করেছিল বা করতে বাধ্য হয়েছিল। ফলে সেখানে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে শিক্ষাব্যবস্থায় ধ্বস নেমেছিল; কেননা শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা অবদান রাখত। আবার মুসলমানের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতো নিষ্কর ভূমির আয় হতে। ইংরেজরা লাখেরাজ সম্পত্তি আইন করলে তা অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে ইংরেজদের দ্বারা মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়।

তাছাড়া শাসনের প্রথম দিকে ইংরেজরা এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব অনুভব করেনি; বরং কোম্পানির লাভের দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। এই লাভের মধ্যে তারা দেশবাসীকে শিক্ষিত করে প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ করে দেওয়ার কোনও অর্থই দেখেনি। অবশ্য তাদের এই উদাসীনতার মধ্যে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও ছিল। তারা দেখেছে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে তাদের আমেরিকা হারাতে হয়েছিল, ভারতের ক্ষেত্রে একই ভুল আর করতে চায়নি (আজিজুর, ১৯৮২ : ১৮৬)। তাছাড়া ইংরেজদের গৃহীত ভারতে শিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টায় লাভবান হয়েছে মূলত হিন্দুরা। আজিজুর রহমান মল্লিক এ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> কোম্পানীর প্রাথমিক প্রচেষ্টায় কোলকাতায় যাদেরকে শিক্ষিত করতে চেয়েছিলো, সেখানে হিন্দুর সংখ্যাই ছিলো। বাংলার পূর্ব এবং উত্তর অঞ্চলের জেলাসমূহে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারের কোন সাহায্য ও মনোযোগ পায়নি। দারিদ্র্য মুসলমানদের শিক্ষাগ্রহণে আরো একটি প্রবল অন্তরায় ছিলো। এসব কারণসমূহ ছাড়াও বলা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের নীতি ছিলো বিপথগামী এবং অনেকক্ষেত্রে সৎ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের তুলনায় হিন্দুরাই বেশী উপকৃত হয়েছে। (আজিজুর, ১৯৮২ : ২১৩)

শিক্ষাক্ষেত্রে দৈন্যদশার ফলে বাঙালি মুসলমানের কত দূর শোচনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায় আনোয়ার হোসেনের 'বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা' (মোহাম্মদী, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪) প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন :

> শিক্ষা বিষয়ে আমরা বাঙালি মোছলমান কতদূর অনুন্নত, তাহা কল্পনা করিলেও নৈরাশ্যের অন্ধকার আমাদের মনকে ছাইয়া ফেলে। মোছলমান আজ ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিল্প প্রভৃতি অর্থকরী ব্যাপারেও সবচেয়ে পিছনে পড়িয়া আছে। উকিল, ডাক্তার, কেরানী ও নকলনবিশের কাজ হিন্দুরই একচেটিয়া। অফিস আদালতে, মহাজনের গদিতে, সওদাগর অফিসে, রেল-

> স্টীমার স্টেশনে আমরা আজ দুই একজন মোছলমান কর্মচারী দেখিতে পাই মাত্র। যেখানে কুলি-মজুর, সেইখানেই মোছলমান দলে দলে দেখা যায়। (দিলওয়ার, ১৯৯৪ : ২)

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানরা হিন্দুদের তুলনায় কতখানি পিছিয়ে পড়েছিল তার একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছেন স্বপন বসু। ১৯৪৯ সালে বাংলার কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রের সংখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে উঠবে :

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	হিন্দু ছাত্র	মুসলমান ছাত্র
সংস্কৃত কলেজ	১৮৯	--
হিন্দু কলেজ	৫১৬	--
কলকাতা মাদ্রাসা	--	১৫২
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির স্কুল	৪৬৯	--
মেডিক্যাল কলেজ	৫৬	৩
হুগলি কলেজ	৫৯৮	২০৮
হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল	২৫২	৪৮
মেদিনীপুর স্কুল	৩৬	৪
ঢাকা কলেজ	৩০১	২৪
কুমিল্লা স্কুল	১১	১৮
চট্টগ্রাম স্কুল	৭২	১৪
সিলেট স্কুল	৪৫	৩
যশোর স্কুল	৯৬	৪

(স্বপন, ২০০০ : ২০৪)

বাঙালি মুসলমান সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও চরম অধঃপতিত অবস্থার মধ্যে বিচরণ করছিল। শুধু তাই নয় যে শিক্ষাটুকু তারা প্রয়োজনীয় হিসেবে গ্রহণ করেছিল তার অনেকখানিই ছিল জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, অবাস্তব ও পরস্পরবিরোধী। শিক্ষণীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে ধর্মান্ধতা, যুগচাহিদার অনুপোযোগী ঐতিহ্যপ্রীতি তাদের শিক্ষাজীবনকে এক প্রকার আড়ষ্ট অবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখে ছিল। (হাবিব রহমান, ২০০৩ : ১৭৫-১৭৬)

বাঙালি মুসলমান পুরনো প্রণালিতেই তাদের শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এমনকি বিংশ-শতাব্দীর তৃতীয় দশকে এসেও তারা শিক্ষাক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শরণাপন্ন হয়নি। পুরাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষাকে আঁকড়ে থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তারা আধুনিক জীবন ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অথচ হিন্দুরা আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ করার ফলে তাদের মধ্যে রামমোহনের মতো পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয়েছে এবং পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানশিক্ষার কেন্দ্র হিন্দু কলেজের (১৮১৭) মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু এর এক শতাব্দী পরে এসেও বাঙালি মুসলমান সমাজে রামমোহনের মতো প্রতিভার আবির্ভাব হয়নি বা হিন্দু কলেজের মতো আধুনিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি (সিরাজুল, ২০১৫ : ১৭৬) শুধু আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ না করার কারণে।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় উনিশ শতকের সপ্তম দশকে। কিন্তু এ শিক্ষা কেবল তাদের কাছে অর্থোপার্জন ও চাকরি পাওয়ার হাতিয়ার হিসেবেই গণ্য হয়েছিল। শিক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যের দিকটি মুসলমানদের কাছে এক রকম উপেক্ষিত ছিল। আর সে কারণেই উনিশ শতকে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু–সমাজে প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলেও মুসলমান-সমাজে তার অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে হিন্দুদের

তুলনায় প্রায় অর্ধ শতাব্দী পরে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়; তবুও একথা সত্য যে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষাকে জ্ঞানার্জনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা না করে একান্তই চাকরির উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিল। (সিরাজুল, ২০১৫ : ১৭৩)

যতদিনে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের আগ্রহ সৃষ্টি হয় ততদিনে তাদের অবনতি হয়েছে সর্বগ্রাসী। মোহম্মদ বরকতুল্লাহ মুসলিম সাহিত্য সমাজের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে মুসলমানদের এই করুণ অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন :

> যতদিন পর্য্যন্ত রাজকীয় অফিসসমূহে ইংরাজী ভাষা প্রবর্তিত না হইয়াছিল অর্থাৎ যতদিন পার্শী ভাষায় সকল কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত ততদিন পর্য্যন্ত মুসলমানগণ ইংরাজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র অনুভব করেন নাই। হঠাৎ যখন দেখা গেল অফিস আদালতসমূহ হইতে পার্শী হরফ বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং ইংরাজী হরফ তাদের স্থান দখল করিয়াছে তখনই বোধ হয় রিক্ত জলাশয়ের মৎস্যের মত মুসলমান মুন্সীর দল মুষড়িয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা তখন হইতে অনুভূত হইতে থাকিলেও উক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা হয়ত আজিও সমগ্র মুসলিম-সমাজ উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারে নাই। (হাবিব রহমান, ২০০২ : ১২২)

আসলে বাঙালি মুসলমান সমাজের শিক্ষাপ্রণালিটি ছিল একান্তভাবেই ধর্মনির্ভর। তাদের মধ্যে "বৈষয়িক উন্নতি কিংবা জ্ঞানচর্চার জন্য ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষার মনোভাব প্রায় অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ বা বর্জনের কোন প্রশ্নই ওঠে না" (ওয়াকিল, ১৯৯৭ : ৪৭৩)। তারা যে আরবি-ফারসির চর্চা করত সেটা মূলত ইসলামের ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ আরবি-ফারসিতে রচিত বলেই। তবু এই ফারসির জ্ঞান তাদের জীবিকা অর্জনে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু অফিস-আদালতে ফারসির পরিবর্তে ইংরেজি চালু হলেও মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষায় আগ্রহ দেখায়নি। এর মূল কারণ তাদের অতিমাত্রার ধর্মকাতরতা। ঐ সময় যারা মুসলমান সমাজকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের সকলেই ছিলেন মাদ্রাসা পড়ুয়া ফলে তাদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি।

বস্তুত বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রথাগত শিক্ষায় যে মুসলমানের প্রয়োজন মিটছে না বরং তা উন্নতি-অগ্রগতির অন্তরায় হিসেবে দেখা দিয়েছে, এ সত্য মুসলমানদের উপলব্ধিতে ধরা পড়তে বিলম্ব হয়েছে। আবার মুসলমান সমাজে প্রচলিত যে শিক্ষাব্যবস্থা তা চিত্তবিকাশের অন্তরায় এবং জ্ঞানচর্চার পক্ষেও অনুকূল নয়। হিন্দু-মুসলমানের তুলনা করে মুসলমানের অবস্থা তুলে ধরতে গিয়ে আবুল হুসেন বলেছেন :

> [...] নবসৃষ্টি সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে। হিন্দু আজ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে নানা জ্ঞানে বিভূষিত হয়ে তার অতীতের প্রতি বর্তমান জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে। আজ আমরা তাদেরও সমকক্ষ হতে পারছি না কেন? তার কারণ আমাদের সুশিক্ষার অভাব। আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি চিত্ত-বিকাশ ও মস্তিষ্ক-সম্প্রসারণের অন্তরায় হয়েছে। এই শিক্ষা-পদ্ধতি কেমন করে যুগের প্রয়োজন মিটাতে পারে এই হচ্ছে সমস্যার সমস্যা। (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৫৪)

মুসলমান সমাজে জ্ঞানের প্রতি প্রকৃত ক্ষুধাবোধের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। যে কারণে দেখা যায়, একশত বৎসর পূর্বেই হিন্দুরা সংস্কৃতচর্চাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করে নিয়েছিল, কিন্তু মুসলমানরা একশত বৎসর পরে এসেও সে মানসিকতার পরিচয় তো দেয়ইনি বরং ইংরেজি জ্ঞান যখন আবশ্যক হয়ে উঠল তখনও তারা পুরাতন আরবি শিক্ষার সঙ্গে একটুখানি ইংরেজি জুড়ে দিয়ে পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থাকেই পুনঃপ্রবর্তিত করল নব-প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৫৮)। আবুল হুসেন মর্মাহত হয়েছেন এই ভেবে যে, "প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, সে বুদ্ধি আজও আমাদের হয়

নাই। আজ তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরেজি জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছি।" (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৫৮)

ইংরেজ শাসনামলে ভারতে মুসলমানদের জন্য দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মক্তব-মাদ্রাসাকেন্দ্রিক পুরনো ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি ছিল যুগোপযোগী স্কুল-কলেজকেন্দ্রিক সাধারণ শিক্ষা। শেষোক্তটি ছিল সকল সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাধারণ শিক্ষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি। বস্তুত শিক্ষা বলতে বাঙালি মুসলমান সব সময় মাদ্রাসা শিক্ষাকেই বুঝে এসেছে। আর এর পিছনের কারণ তাদের অতিমাত্রার ধর্মপ্রীতি। এই অন্ধ মাদ্রাসাপরায়ণ মনোবৃত্তির কারণে তারা এর ক্ষতিকর দিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। বাঙালি মুসলমান মোল্লাদের ফতোয়া তাড়িত হয়ে তারা মাদ্রাসা শিক্ষার বাইরে বের হতে পারেনি। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। এ প্রসঙ্গে খান বাহাদুর নাসির উদ্দীন আহমদ একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেছেন :

> স্মরণ আছে একবার কোন Distric board-র meeting-এ প্রস্তাব হয়েছিল যে New Scheme মাদ্রাসার Experiment-এর জন্য সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে Old Scheme মাদ্রাসায় সাহায্য দেওয়া হোক, কারণ New Scheme মাদ্রাসায় পড়া যুবকরা জানাজার নামাজ পড়াতে পারে না! এতে মনে হয় যেন সমস্ত মুসলিম বঙ্গ মৃত বা মৃতপ্রায় হয়ে আছে, কেবল আমাদের মৌলবী মৌলানা সাহেবেরা দয়া করে জানাজা পড়ে কবরস্থ করলেই হয়। আজকাল মাদ্রাসার সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। এক গ্রামে একটা মাদ্রাসা হ'লে অন্য গ্রামের লোকেরা অন্য একটি না খুলতে পারলে তাদের মানের লাঘব হল বলে মনে করে। আমি দেখেছি গ্রামে গ্রামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর Distric board-এর Free primary school ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। (হাবিব রহমান, ২০০২ : ৯০)

মুসলমানরা শিক্ষা বলতে আসলে কি বুঝে থাকে তার স্বরূপ সম্পর্কে কাজী আনোয়ারুল কাদীর বলেছেন, এখনও একদল অভিভাবক স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার বিপক্ষে এবং তারা যে আসলে কোন শিক্ষার পক্ষে তা নির্ণয় করা কঠিন। কারণ প্রথমে তারা ইংরেজি শিক্ষাকে বর্জন করার ফতোয়া দিয়েছিলেন তা 'কাফেরি এলেম' বলে। বস্তুত তারা ধর্মশিক্ষা চান, আর এ ধর্মশিক্ষার জন্য কলকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু দেখা গেল মাদ্রাসা পাস করে পেটের অন্নের সংস্থান হয় না, অগত্যা যে নতুন ধরনের মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে সেখানে পড়ানোর ব্যাপারে তাদের সম্মতি পাওয়া গেল। এখানে যে অল্পবিস্তর ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া হয় তাতে বিশেষ বাধা নেই কিন্তু বেশি ইংরেজি শিখলে যে গুনাহ হবে, এ মনোভাব তাদের মধ্যে বর্তমান ছিল। প্রাবন্ধিক সংশয় প্রকাশ করেছেন এই শিক্ষা তাদের জীবনসংগ্রামে কতটুকু সহায়তা করবে এটা ভেবে (আনোয়ারুল, ২০১০ : ৩৯)। তিনি বাঙালি মুসলমানের শিক্ষাবিষয়ক মনোভাবের পরিচয় প্রসঙ্গে সিদ্ধান্তে এসেছেন, "তবে মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে যে আমরা বুদ্ধির মুক্তি চায় না। আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, দর্শন, বিজ্ঞান আর যা-কিছু সব বাদ দিয়ে শিক্ষাটুকু হলেই বস্ বলতে চাই।" (আনোয়ারুল, ২০১০ : ৩৯)

ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্নতার কারণে মাদ্রাসা পড়ুয়া তৎকালীন সমাজ-নেতারা যুগ যুগ ধরে এ কথাই বলে এসেছে যে ইংরেজদের প্রবর্তিত সাধারণ শিক্ষায় মুসলমানের বিপদ, অতএব ওদিকে যাওয়া যাবে না। তারা বারবার মুসলমানের দৃষ্টি আধুনিক শিক্ষা থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার দিকে ফেরাতে চেষ্টা করেছে। ফলে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষার দিকে অগ্রসর হতে পারেনি। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বলেছেন—

> আজও, যখন সাধারণ শিক্ষার রথ চলছে রাজপথ বেয়ে সসমারোহে, মুসলিম পথিকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ কচ্ছে তার অনিবার্য্য গতিচ্ছন্দে, পিছন থেকে এঁরা হেঁকে বলছেন :

> হুশিয়ার ভাই মুসলিম, ও রথ নিয়ে যাবে তোমাদের জাহান্নামে; তোমরা উঠে এসো স্বর্গের সিঁড়িতে, এই সে সিঁড়ি মাদ্রাসার মুক্ত দ্বারে। (আবদুল মান্নান, ১৯৯২ : ২৮)

একসময় এরাই তাদের সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোতে সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিশাপের বাণী উচ্চারণ করেছে। সাধারণ শিক্ষার বিরুদ্ধে অহরহ প্রতিবাদ আর ব্যঙ্গবিদ্রুপের দ্বারা মুসলমানদের এ শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব গঠন করেছে আবার আজ তারাই সাধারণ শিক্ষায় ইসলামী ভাবধারার অভাব দেখে চোখের পানি ফেলছে। (আবদুল মান্নান, ১৯৯২ : ২৮)

বাঙালি মুসলমান ছাত্ররা প্রাথমিক শিক্ষা হিসেবে মক্তব বা মাদ্রাসায় যা পড়ে থাকে তাতে স্পষ্টতই ধারণা করা যায় যে এ শিক্ষা আধুনিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য, বাস্তবতাবর্জিত ও কিছুটা কুসংস্কারাচ্ছন্নতাজাত। মমতাজউদ্দীন আহমদ তাঁর 'শিক্ষা-সমস্যা' প্রবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে—

> প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান ছেলেরা পাঠশালা মক্তব যেখানেই পড়ুক সাধারণতঃ দুই এক বৎসর তাহারা কোরান শরীফ পড়িয়াই কাটাইয়া দেয়। তারপর বাংলা এবং উর্দ্দু এক সঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করে। কেহ কেহবা সঙ্গে একটু পার্শী বয়েত পড়ে। বাংলা পড়াটা তাদের পক্ষে বাহুল্য এবং বিলাসিতা মাত্র। বলাবাহুল্য আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, কেতাব কোরান ছেলেমেয়েরা আদৌ না বুঝিয়াই পাঠ করে। সাধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে, আরবী-কোরান শরীফ, এমনকি আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু যে কোন কেতাব না বুঝিয়া পড়িলেও পুণ্য হয়। শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা বলাটা বেশ সুশিক্ষার, পরিমার্জ্জিত রুচির এমনকি আভিজাত্যের পরিচায়ক মনে করেন। (মুস্তাফা নূরউল, ২০০৩ : ৯২)

এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, মাতৃভাষা বাংলার প্রতি বাঙালি মুসলমানের নিদারুণ অবহেলা। উর্দুর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত পক্ষপাত এবং মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার দরুণ বাঙালি মুসলমান সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রেও চরম দুর্দশায় পতিত হয়।

সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য যে প্রয়োজন যুগোপযোগী শিক্ষা, হিন্দু সম্প্রদায় এই বিষয়টি অনুধাবন করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে উন্নতির পথে ধাবিত হলো, আর দুর্ভাগা মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা থেকে মুখ ফেরাল, ফলে তাদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটলো না বরং ধীরে ধীরে তারা অবনতির পথে এগিয়ে চলল। যদিও ইংরেজি শিক্ষিত কিছু মুসলমান ইংরেজি শিক্ষা-বিস্তারে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু আরবি শিক্ষিত মৌলবিদের দ্বারা তা ব্যহত হলো। এর ফল হলো :

> [...] মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ মৌলভি সাহেবগণ তাঁদের পেশা বহাল রাখার জন্যই হোক বা অন্য কারণেই হোক ঐ বিশ্বাস (credulity) অটল করে রাখতে সহায় হলেন। পক্ষান্তরে ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমান আরবি শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলেন। এইরূপে মুসলমান সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। উভয় দলের সঙ্গে কোন রফা বা বনিবনাও হলো না; বরং একে অপরের নিন্দা অপবাদ দিয়ে সমাজের জনসাধারণকে বিব্রত করতে লাগলেন। জনসাধারণ মৌলভি সাহেবদেরই প্রভাবে যুগসঞ্চিত কুসংস্কারপীড়িত হয়ে ইংরেজি শিক্ষিতগণকে ঘৃণা করতে লাগল। তারা তাদের প্রচারিত ধর্মবিশ্বাসের প্রভাবে 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' পড়ে থাকল। (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৫৯-৬০)

ভারতে প্রতীচ্য শিক্ষার গোড়াপত্তন হয় লর্ড মেকলে ও তাঁর সহযোগীদের প্রেরণায় ১৮৩৫ সালে। মূলত এরপর থেকেই হিন্দু ও মুসলমানের শিক্ষায় এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। সময়ের গতিকে হিন্দুরা সহজেই উপলব্ধি করে প্রতীচ্য শিক্ষাকে বিপুল আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করে। অন্যদিকে রাজ্য হারিয়ে নিজের কালচারকে আঁকড়ে ধরার মানসে মুসলমানরা নূতন

উৎসাহের সঙ্গে আরবি ও ফারসির চর্চায় নিজেদের ব্যাপৃত রাখে। যে কারণে সমগ্র বাংলা জুড়ে মুসলমানরা শুধু মাদ্রাসা শিক্ষার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করেছিল। ফলস্বরূপ তারা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি কোনো প্রকার মনোযোগ দেয়নি। সেই থেকে মুসলমান সমাজে শিক্ষা বলতে শুধু মাদ্রাসা শিক্ষাই চলে এসেছে। সেই মাদ্রাসা শিক্ষার জের এখনও মেটেনি। মাদ্রাসা এখনও মুসলমান শিক্ষার এক বড় সমস্যা হিসেবেই রয়ে গেছে। স্যাডলার কমিশনের মতে, যদি ১৮৫৪ সালের Education dispatch-এর ফলে মাদ্রাসা-শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হতো, তবে মুসলমান শিক্ষার ধারা একেবারে বদলে যেত। (হাবিব রহমান, ২০০২ : ৯৮)

একদিকে নূতনের আহ্বান অন্যদিকে পুরাতনকেও আঁকড়ে ধরার ঐকান্তিক বাসনা—এ দুয়ের সম্মিলিত প্রয়াসে শিক্ষাক্ষেত্রে ১৯১২ সালে প্রবর্তিত হলো 'নিউস্কিম'। যেখানে পুরনো মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সবই থাকলো, পাশাপাশি যুগোপযোগী দুএকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলো। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলও খুব সুখের হলো না। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লিখেছেন :

> [...] বিশ বছর কিম্বা তারও উর্দ্ধকাল এই ঢাকাই দাওয়া খাইয়ে সমাজকে পরিচর্য্যা কর্ব্বার পর দেখা গেলো ঃ মিশ্রিত পদার্থটী বিশেষ ফলোপদায়ক কিছু হয়নি, বরং ওতে মুসলমানের পঙ্গুতা বেড়েই চলেছে। তাই দেখতে পাই সরকারী দফ্তরখানায়ই ওকে নিয়ে আজও অনেক মাজা-ঘষা অনেক যোগ-বিয়োগ চল্‌ছে। (আবদুল মান্নান, ১৯৯২ : ৩২৫)

শিক্ষার্থীর উপর নিউস্কিমের বিষময় প্রভাব উপলব্ধি করে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছেন। কারণ, এই ব্যবস্থা অনুসারে কোমলমতি বালকদের অন্তত চারটি ভাষা শিক্ষা করতে হয়, যা তার মন ও মস্তিষ্কের উপর ভীষণ অত্যাচার বলে মনে হয়। সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাংলা ও ইংরেজি, ধর্মশিক্ষার জন্য উর্দু ও আরবি—এই চারটি ভাষা একত্রে শিক্ষা দিতে গিয়ে তার উপর যে অত্যাচার করা হয় তার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের জ্ঞান, চিন্তা ও কর্ম মহৎ ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে না। (আবদুল মান্নান, ২০১৩ : ১৩৩)

নিউস্কিম শিক্ষাব্যবস্থার ভয়াবহতা আরও অনেক লেখকই উপলব্ধি করেছেন। আবুল হুসেন এর বিষময় দিক তুলে ধরে লিখেছেন—

> [...] উর্দু, বাংলা, আরবির চাপে শৈশবেই শিক্ষার্থীর মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। গণতি করে দেখা যাক, আমি খুব জোর করেই বিশ্বাস করি, শতকরা অন্তত ষাট জন জুনিয়ারের ছাত্র শেষ শ্রেণীতে উঠবার আগেই শিক্ষার খাতা হতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। আর যারা উত্তীর্ণ হচ্ছে মুষ্টিমেয় কয়টি সিনিয়র মাদ্রাসায় পড়বার জন্য তাদের অনেকেই সংস্থান করতে পারছে না। এই যে বিপুল অপচয় এর জন্য দায়ী কে? (আবুল কাসেম ফজলুল, ২০০৩ : ৬৫)

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? এ প্রশ্ন সম্ভবত বাঙালি মুসলমানের মনে উত্থাপিত হয়নি, হলে তার শিক্ষা শুধু চাকরি লাভের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হতো না। শুধু চাকরির জন্যই শিক্ষা নয় বরং শিক্ষার অন্য সার্থকতা আছে। সেই সার্থকতার কথা বলেছেন আবুল হুসেন। তিনি বলেছেন—"আমার মনে হয়, শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে–মানুষকে এই সুন্দর ভুবনে কল্যাণ, প্রেম ও সৌন্দর্যপুষ্ট জীবন-যাপনে শক্তিমান ও নানা দৃষ্টিক্ষম ক'রে তোলা" (কাদির, ১৯৭৬ : ১৫১, ১৫২)। পাশাপাশি সেই শিক্ষাকে তিনি নিরর্থক বলেছেন, যে-শিক্ষা মানুষকে এ-সমস্ত দিতে পারছে না। আসলে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষমতা দান করতে পারে যে-শিক্ষা তাকেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যায়। (কাদির, ১৯৭৬ : ১৫২)

এ-জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন অনেকেই। মোজাফ্ফর আহমদ এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকে একেবারে ভেঙে চুরে নতুন করে গড়ে তোলার অভিমত দেন। সেই সঙ্গে

মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি কেমন হবে তারও রূপরেখা অঙ্কন করেছেন তিনি। তাঁর মতে, মাদ্রাসায় মাতৃভাষা অবশ্য পাঠ্যরূপে পঠিত হওয়া উচিত। আর মাদ্রাসার শিক্ষার মাধ্যম উর্দু বা পারসি না হয়ে বাংলাই হওয়া উচিত। তবে আরবি শিক্ষার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি। ইংরেজি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে গ্রহণের পক্ষে মত দেন। এছাড়া উর্দু, হিন্দি, গুজরাটি, তেলেগু, পশতু ও পারসি প্রভৃতির শিক্ষাদান মাদ্রাসায় করা উচিত। ছাত্ররা ইচ্ছা করলে অন্য একটা ইচ্ছাধীন বিষয় ছেড়ে এর মধ্য থেকে যে কোনও একটিকে পড়তে পারবে। তাছাড়া কোরআন-হাদিস খুব ভালোভাবে মূল হতে পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ফেকহার কেবল মূলসূত্রগুলো পড়ালেই চলবে, কারণ আরবি ভাষায় অধিকার জন্মালে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ফেকহার কিতাব পড়ে বুঝে নিতে পারবে। এছাড়াও শ্রেণি বিভাগ অনুযায়ী জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, লজিক, আধুনিক বিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই পন্থা অবলম্বন করলে মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থায় এক অদ্ভুৎ পরিবর্তন আসবে এবং ছাত্ররা চৌকশ হয়ে বর্তমান জগতের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে বলে লেখক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (রবিউল, ২০১৯ : ২২৮, ২২৯)

এস ওয়াজেদ আলী পার্শ্ববর্তী হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছেন, এই পর্যায়ের হিন্দু ছাত্রদের সাধারণ পাঠ্যবিষয় ছাড়া শুধু মাতৃভাষা ও ইংরেজি পড়তে হয়। মুসলমান ছাত্রদের এতগুলো বিষয় শিক্ষা করতে গিয়ে সমুদ্রে কূল হারানোর মতো অবস্থা হয়। ফলে কোনও বিষয়ই উত্তমরূপে শিখতে পারে না। জ্ঞান অর্জন তাদের কাছে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। তাদের শরীর ভেঙে পড়ে, তাই এরপর যখন তারা হাইস্কুলে যায় তখন হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে টিকতে পারে না। (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৬ : ৪০০)

ইংরেজ সরকারও চায় না মুসলমানরা জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হোক। সে জন্য দেখা যায় সরকার একটা জুনিয়র মাদ্রাসায় যে টাকা সাহায্য করেন তার সিকি অংশও একটি এম. ই স্কুলের জন্য করেন না। কারণ, সরকার চায় মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে "মুসলমানদের নির্বুদ্ধিতা, গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে পাকা করে তাকে অধিকতর নিরূপায়, দুর্বল, কাপুরুষ ও ভণ্ড করে তুলতে। মুসলমান তো মধ্যযুগের ইসলামী কৃতিত্বের মোহ-মুগ্ধ আছেই, তার সেই জোশের সুযোগ নিয়ে তিনিও তার মতলব হাসিল করছেন।" (হাবিব রহমান, ২০০৭ : ৩২)

মাদ্রাসাশিক্ষা-ব্যবস্থা যে মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর এ উপলব্ধি মুসলমানের হয়েছে অনেক দেরিতে। এর ক্ষতিকর দিক উপলব্ধি করে অনেক চিন্তাবিদই এই শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়েছেন। মমতাজউদ্দীন আহমদও এ শিক্ষার ক্ষতিকর দিক তুলে ধরে এ শিক্ষাকে পরিহার করার দিকে মতামত প্রদান করেছেন। কারণ, "[...] মাদ্রাসা-শিক্ষা শিক্ষার Cultural এবং Practical দুইদিকেই অসম্পূর্ণ, ক্ষতিজনক, অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য" (মুস্তাফা নূরউল, ২০০৩ : ৯৪)। তাঁর মতে, ওল্ড স্কিমের জায়গায় যে নতুন শিক্ষা-প্রণালি অর্থাৎ নিউস্কিম প্রবর্তিত হয়েছে তাতে পুরাতনের দোষগুণ পূর্ণমাত্রায় আছে। বরং ক্ষতির দিকটাই বেশি কারণ এখানে বাংলা ও ইংরেজি যুক্ত হওয়াতে শিক্ষার্থীদের আগের মতো শাস্ত্রজ্ঞানটাও হচ্ছে না। (মুস্তাফা নূরউল, ২০০৩ : ৯৪)

এখানে নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটিও উত্থাপিত হতে পারে। বাস্তবতা হলো, যে সমাজে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পুরুষেরাই পুরোপুরি সচেতন নয় সেখানে নারীশিক্ষার বিষয়টি উপেক্ষিত থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তবে মুসলমান সমাজের বড় ঘরের মেয়েরা আরবি, উর্দু, ফারসি পড়তে পারত আর নিম্নশ্রেণির মেয়েরা ধর্মীয় কারণে সামান্য আরবি পড়ার সুযোগ পেত। একে কোনোভাবেই যথার্থ শিক্ষা বলা চলে না (হাবিব রহমান, ২০১০ : ১৫)। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মুসলমানের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন স্ত্রীশিক্ষায় ঔদাস্যের বিষয়টি।

বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার সংকটটি ছিল মর্মান্তিক। আসলে সমাজে পুরুষেরা যথেষ্ট শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত না হওয়ায় স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সুব্যবস্থা হয়নি। কাসেমা খাতুন বলেছেন— "আমাদের বাপ, ভাই, মামু, খালু, চাচা প্রভৃতি অর্থাৎ যাদের নিয়া পুরুষ সমাজ গঠিত, সেই পুরুষ সমাজের শিক্ষাহীনতাই যে নারী-জাতির অশিক্ষা দোষের জন্য অনেকাংশে দায়ী তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই" (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৩ : ৪৮)। তিনি ধারণা করেছেন যে, পুরুষেরা যথেষ্ট শিক্ষার আলোক পেলে ঘরের মা, বোন, খালা, জায়া প্রভৃতিকে শুধু ভাতরাঁধুনী অথবা দুনিয়ার যত সব কু-শিক্ষা ও কু-সংস্কারে জড়িয়ে চাকরাণীর মত চিরদিন রেখে দিতে পারতেন না। (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৩ : ৪৮)

নারীজাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একাধিক রচনায় আলোচনা করেছেন। তিনি দেখেছেন, নারীশিক্ষার গোড়ার বিষয় আলোচনা করতে গেলে সামাজিক অবস্থার কথা উঠে আসে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা পুরুষের প্রতিকূলে চলে যায়। তাই তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, "স্ত্রীশিক্ষার কথা বলিতে গেলেই আমাদের সামাজিক অবস্থার আলোচনা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আর সামাজিক অবস্থার কথা বলিতে গেলে, নারীর প্রতি মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের অবহেলা, ঔদাস্য এবং অনুদার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষপাত অনিবার্য হয়। প্রবাদ আছে, বলিতে আপন দুঃখ পরনিন্দা হয়।" (রোকেয়া, ২০১৫ : ২২৬)

রোকেয়া তাঁর প্রবন্ধে খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, সমাজের অর্ধেক অংশকে বিকল রেখে উন্নতি লাভ করা কখনই সম্ভবপর নয়। আর এজন্য বোম্বাই, লাহোর ও আলীগড়ের মুসলমান পুরুষগণ নারীশিক্ষার প্রসারে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন (রোকেয়া, ২০১৫ : ২০৪)। রোকেয়া তাঁর 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি' প্রবন্ধে আলীগড়ের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারি শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ্‌র কথা তুলে ধরেছেন। কারণ, আলীগড়ে নারীশিক্ষা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা রোকেয়ার উদ্দেশ্য। রোকেয়া বলেন :

> আলীগড়ের প্রসিদ্ধ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী শেখ মহম্মদ আবদুল্লাহ্ সাহেব এক সময় তাঁহার কোন বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "এদেশে বালক ও বালিকার শিক্ষায় পার্থক্য রাখার ফলে আমাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদে! বালিকাদের শিক্ষা না দেওয়া আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় নহে, বরং ইহা আমাদের দুরপনেয় কলঙ্ক।" (রোকেয়া, ২০১৫ : ২২৬, ২২৭)

রোকেয়া বাঙালি মুসলমান সমাজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সবিশেষ ওয়াকিবহাল। কিন্তু তিনি আশার আলো দেখতে পেয়েছেন। চারিদিকে যেভাবে নারীশিক্ষার প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে তাতে মুসলমান সমাজেও নারীর জাগরণ সময়ের ব্যাপার। প্রথম প্রথম সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কিন্তু তাতে নিরাশ না হয়ে রোকেয়া নারীদের জাগরণপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, সব সমাজেই প্রথমে বিরূপতা দেখা দিয়েছে কিন্তু পরে তারা প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করেছে। তাই রোকেয়ার বক্তব্য :

> আমাদের শিক্ষার অন্তরায় অনেক, জানি; বাঙ্গালী মুসলমানগণ অত্যন্ত নারীবিদ্বেষী, ইঁহারা উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে জ্ঞানপুরীর তোরণ রক্ষা করিতেছেন, জানি। তবু আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। সকল দেশেই কতকগুলি পুরুষ স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী হয়। ইংলন্ডের পুরুষ সমাজ উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্তা রমণীদের "ব্লুস্টকিং" বলিয়া বিদ্রুপ করেন; শিক্ষিত বঙ্গবালাও "নভেলপাণি" আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। [...] যাহা হউক, এত হিংসা-বিদ্বেষ উপেক্ষা করিয়াও ইংরেজ ললনা মাথা তুলিয়াছেন; এবং বঙ্গীয়া (ব্রাহ্ম) ভগিনীরাও মাথা তুলিতেছেন; এবার মোসলেম ললনার পালা। (রোকেয়া, ২০১৫ : ২০৫)

স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সমাজের মুক্তদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষেরাও উপলব্ধি করেছিলেন। এ সম্পর্কে মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা' প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেছেন। মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার অপ্রচলনকে তিনি দুর্লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন, বাঙালি মুসলমান যদি শিক্ষা ও সভ্যতার সকল দিক দিয়ে উন্নতি করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাদের নারীশিক্ষার বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাবন্ধিকের ভাষায় :

> নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে মুসলমানগণ সংখ্যায় গরিষ্ঠ হইয়াও বিজাতীয় কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতার দরুন বঙ্গীয় মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টাই করে নাই। ইহা যে খুবই দুর্লক্ষণ এবং ইহাতে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগমন যে অনেকটা ব্যাহত ও অভিশপ্ত হইয়া রহিবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। বাঙ্গালী মুসলমান যদি শিক্ষা ও সভ্যতার সব দিক দিয়া উন্নতি করিতে চান—একটা সুসভ্য জাতি রূপে বাঁচিয়া থাকিতে চান, তবে নারী জাতির উন্নতি ও শিক্ষার প্রতি তাহাদের বিশেষ নজর প্রদান করিতে হইবে। (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৩ : ১৭৩)

নারীশিক্ষার দুরবস্থার জন্য আবুল ফজল এদেশের পিতাদের অজ্ঞতাকে দায়ী করেছেন। তিনি মনে করেন, জাতির উন্নতি বলতে শুধু পুরুষের উন্নতি সাব্যস্ত করে এ দেশের পিতা শুধু পুত্র সন্তানকেই লেখাপড়া শিখিয়ে আসছে; তার কন্যাও যে জাতির একজন সদস্য বরং জাতির ভবিষ্যৎ জননী এ চিন্তা সে কোনোদিন করেনি। পুত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যা সন্তানেরও যে সুশিক্ষার প্রয়োজন আছে একথা এদেশবাসী অনেক দিন হতে ভুলে বসে আছে। তারা কন্যাকে অন্ধকারে পিঞ্জরাবদ্ধ রেখে যেন-তেন প্রকারে নয়-দশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ভাত কাপড় দিয়ে পাত্রস্থ করতে পারলেই পিতার দায়িত্ব শেষ হয়েছে ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে (নাসিরউদ্দীন, ১৩৩৬ : ৩১১)। আলোচ্যমান প্রবন্ধে তাই প্রাবন্ধিক নারীজাগরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন এবং নারীকে শিক্ষিত ও কর্মমুখর হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। আর এসবের জন্য নারীকে অবরোধ ভেঙে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা শুধু নারীর জন্য নয় বরং পুরুষের পূর্ণতার জন্যও নারীর শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। আবুল মজফফর আহমদ মনে করেন, নারী শিক্ষিত না হলে পুরুষ পঙ্গু থেকে যায়। মুসলমান সমাজের অবস্থা হয়েছে তাই। যদিও ধর্মগুরু নর-নারীকে সমানভাবে শিক্ষিত করার আদেশ দিয়ে গেছেন কিন্তু সংকীর্ণচিত্ত মৌলবি-মৌলানাদের প্রভাবে সে আদেশ বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তার ফলস্বরূপ মুসলমান সমাজে নারীমাত্রই অশিক্ষিত রয়ে গিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে অবনতির অভিশাপ নেমে এসেছে। প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন যুগে যুগে দেশে দেশে যে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে তাদের জীবনে মায়েদের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। আধুনিক জগতের বীর্যবান উন্নতশির জাতিসমূহ এমনকি তুরস্ক, মিশর, সিরিয়ার মতো মুসলিম দেশগুলো আজ নারীশিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করে স্কুল-কলেজের দ্বার নারীর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় ভারতের মুসলমানগণ এ বিষয়ে সাংঘাতিকরূপে পশ্চাৎপদ। ভারতবর্ষের হিন্দুরাও নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে তার প্রসারে সচেষ্ট হয়েছেন। (হাবিব রহমান, ২০০২ : ৭৫)

বাঙালি মুসলমান সমাজে প্রচলিত যে শিক্ষাপদ্ধতি সেটিও মেধাবিকাশের উপযুক্ত নয় বলে অনেক চিন্তাবিদ মত প্রকাশ করেছেন। সে জন্য শিক্ষা-পদ্ধতিরও সংস্কার চেয়েছেন লেখকরা। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী 'লেখাপড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য' (সাম্যবাদী, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, কার্তিত ১৩৩১) প্রবন্ধে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিকে মূল্যহীন তাই পরিত্যাজ্য বিবেচনা করেছেন। কারণ, হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন "বর্তমানে আমরা যে শিক্ষা পাইতেছি, তাহাতে

কতকগুলি অক্ষম কেরানী বা চাকুরিয়া সৃষ্টি হওয়া ছাড়া অন্য কোন লাভ হইতেছে না। এরূপ মূল্যহীন শিক্ষাপদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে হইবে" (মুস্তাফা নূরউল, ১৯৭৭ : ৩৮)।

যে কোনও জাতির আত্মচেতনা ও আত্মমর্যাদা লাভের প্রধান উপায় যুগোপযোগী বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় নিহিত। বাঙালি মুসলমানেরও আত্মচেতনালাভের জন্য প্রয়োজন ছিল আধুনিক তথা ইংরেজি শিক্ষার। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই উপলব্ধি তাদের মধ্যে জন্ম লাভ করেছে অনেক দেরিতে। ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে রাজনৈতিক কারণেই মুসলমানদের পিছনে ফেলে বাংলার আরেক সম্প্রদায় হিন্দুদের প্রাধান্য দিয়েছিল। অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপে আয়ের উৎস, জমিদারি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে মুসলমানরা ইংরেজ বিমুখ হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া প্রবল আত্মাভিমান তো ছিলই; আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ধর্মীয় কুসংস্কার, যার দরুন তারা রাজভাষা ইংরেজি গ্রহণ করাকে ধর্মবিরুদ্ধ মনে করেছিল। তাছাড়া মুসলমানদের অদূরদর্শিতা, অভাব-অনটন, সরকারের উৎসাহের অভাব, বিলাসপ্রিয়তা, শ্রমবিমুখতা প্রভৃতি কারণ তাদের ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিল। তবে উনিশ শতকের শেষে এসে মুসলমানের চৈতন্যোদয় হয়; তারা বুঝতে পারে যুগোপযোগী শিক্ষার মধ্যেই তাদের উন্নতি নিহিত। এসময় সমাজ নেতাদের প্রচেষ্টা, ইংরেজ সরকারের কিছুটা আনুকূল্য এবং বিশেষত পাটের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাঙালি মুসলমানের ভিতর ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান প্রথাগত ব্যবস্থার দিকেই দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছিল। ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও রাজনৈতিক অবস্থা এক্ষেত্রে হয়েছিল তার সহায়। তাই উদারমনা, প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা এই বদ্ধ জায়গা থেকে তাদের বের করে আনার ব্যাপক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলেও খুব বেশি ফল লাভ হয়নি। তবে তাঁদের এই আলোচনার ফলে মুসলমান সমাজের বদ্ধ অবস্থা কাটতে শুরু করে এবং তারা আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে।

সহায়কপঞ্জি

আজিজুর রহমান মল্লিক (১৯৮২)। *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান* (দিলওয়ার হোসেন অনূ.)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল কাসেম ফজলুল হক (সম্পা., ২০০৩)। *আবুল হুসেন রচনাবলী* ১ম খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল কাদির (সম্পা., ১৯৭৬)। *আবুল হুসেনের রচনাবলী* ১ম খণ্ড। বর্ণমিছিল, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা., ১৯৯২)। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী* ২য় খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০১৩)। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী* ৩য় খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

উইলিয়াম হান্টার (২০১৬)। *দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্স* (আবদুল মওদুদ অনূ.)। আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা।

ওয়াকিল আহমদ (১৯৯৭)। *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কাজী আনোয়ারুল কাদীর (২০১০)। *আমাদের দুঃখ*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

খোন্দকার সিরাজুল হক (২০১৫)। *মুসলিম সাহিত-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

দিলওয়ার হোসেন (সম্পা., ১৯৯৪)। *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলমান সমাজ*। আনোয়ার হোসেন, 'বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা., ১৯৭৭)। *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'লেখাপড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(২০০৩)। *শিখাসমগ্র*। মমতাজউদ্দীন আহমদ, 'শিক্ষা-সমস্যা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন (সম্পা., ১৩৩৩)। *সওগাত*। কাসেমা খাতুন, 'নারীর কথা', ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আষাঢ়।

(১৩৩৩)। *সওগাত*। মোহাম্মদ আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী, 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান মহিলা', ৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ভাদ্র।

(১৩৩৬)। *সওগাত*। আবুল ফজল, 'বঙ্গ-মুসলিম নারী-জাগরণ', ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, পৌষ।

(১৩৩৬)। *সওগাত*। এস ওয়াজেদ আলী, 'অভিভাষণ', ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাঘ।

রবিউল হোসেন (সম্পা., ২০১৯)। *সেরা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা সংগ্রহ*। মোজাফফর হোসেন, 'বঙ্গদেশে মাদারসার শিক্ষা', অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

বেগম রোকেয়া *রোকেয়া রচনাবলী* (২০১৫)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

স্বপন বসু (২০০০)। *বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস*। পুস্তক বিপণি, কলকাতা

হাবিব রহমান (সম্পা., ২০০২)। *মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর বার্ষিক অধিবেশন : সভাপতিদের অভিভাষণ*। আবুল মজফফর আহমদ, 'তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হাবিব রহমান (২০০৩)। *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হাবিব রহমান (সম্পা. ২০০৭)। *নির্বাচিত সংকলন মাসিক জাগরণ পত্রিকা*। আবুল হুসেন, 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ', ঐতিহ্য, ঢাকা।

হাবিব রহমান (২০১০)। *বাঙালি মুসলমানের সামাজিক ইতিহাস : কতিপয় প্রসঙ্গ*। ধ্রুবপদ, ঢাকা।